বাংলাদেশের কবিতায় ফরাসি ঝোঁক

সুমন সাজ্জাদ

'ফরাসি ঝোঁক' বলতে কী বোঝাতে চাইছি? এই প্রশ্নটির জবাব দিয়েই আরম্ভ করা যাক। বুঝতে চাইছি কবিতা, শিল্পকলা ও দর্শনের প্রতি বাংলাদেশের কবিদের সেই সতর্ক ও অসতর্ক পদক্ষেপ এবং পরিগ্রহণের প্রবণতাকে, যেটি কবি ও কবিতাকে নিয়ে গেছে ফরাসি ভাষা ও সংস্কৃতির দিগন্তে। অর্থাৎ যে-প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ তৎপরতায় কবিরা ঝুঁকেছেন ফরাসি শিল্পসাহিত্যের তটে, সেই তৎপরতা আর নিশানাগুলোই মোটা দাগে ফরাসি ঝোঁক।

বাঙালি বুদ্ধিজীবিতায় 'মাঠের পারের দূরের দেশে' যাবার এই ঝোঁক অভিনব কিছু নয়। ঔপনিবেশিক ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে পেঁচিয়ে আছে এই ঝোঁক। বাংলাদেশের কবিরা ততোদিনে জেনে গেছেন, 'বিশ্বের সেই আদিম উর্বরতা আজ আর নেই। এখন সারা ব্রহ্মাণ্ড খুঁজে বীজসংগ্রহ না করলে কাব্যের কল্পতরু জন্মায় না।'; কথাটি বলেছিলেন তিরিশের দশকের এক আধুনিক কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। আজকের মেট্রোপলিটান, কসমোপলিটন, কর্পোরেট পৃথিবীতে 'বিশ্বায়ন' ছাড়া যেমন চলছে না, তিরিশের দশকের বাঙালি কবিদেরও চলেনি শিল্পতাত্ত্বিক বিশ্বায়ন ছাড়া।

'আধুনিকতা'র খোঁজে কবিরা উঁকি দিয়েছেন নানা দেশের, নানা সংস্কৃতির কাব্যধারায়। তার মধ্যে ইউরোপই হয়ে উঠেছে পরম পূজনীয়। বিশেষ করে এজরা পাউন্ড, টি এস এলিয়ট, ডব্লু বি ইয়েটসের সূত্রে প্রবেশ করেছে ইংরেজি কবিতার স্রোত। আর তাঁদের সাথেই হাত ধরাধরি করে এসেছেন ইউরোপীয় কবিতার প্রভাববিস্তারী কবিবৃন্দ – বোদলেয়ার, র‍্যাঁবো, মালার্মে প্রমুখ। তিরিশের সুধীন্দ্রনাথের ঘোষণাই ছিল, 'মালার্মে প্রবর্তিত কাব্যাদর্শই আমার অন্বিষ্ট।' অবশ্য এমন সরল ঘোষণা বাংলাদেশের কবিরা দেন নি। তবে প্রত্যক্ষত একজন কবির নাম অনেকেই নিয়েছেন, তিনি শার্ল বোদলেয়ার।

মোটা দাগে বাংলাদেশের কবিতায় ফরাসি ঝোঁকের চারটি প্রধান খাত নির্ণয় করা সম্ভব : প্রথমত – বোদলেয়র প্রভাবিত ধারা, দ্বিতীয়ত – র‍্যাঁবো প্রভাবিত ধারা, তৃতীয়ত – পরাবাস্তবতাবাদী ধারা, চতুর্থত – মার্কসবাদ আলোড়িত ধারা; অবশ্য এ-কথাও আমাদের মনে রাখতে হবে যে, চারটি ধারাই ইউরোপীয় কবিতার প্রায় সাধারণ খাত। অনেকে তো মনেই

করেন, প্রতীকবাদ ও পরাবাস্তবতাবাদ শেষ পর্যন্ত বোদলেয়ার ও র‍্যাঁবোরই ভিন্নমাত্রিক বিস্তার। পঞ্চম আরেকটি খাত আমরা সনাক্ত করতে পারি, যা প্রত্যক্ষ কোনো শিল্প বা কাব্য-আন্দোলনজাত নয়, বরং দার্শনিক তত্ত্বাশ্রয়ী ধারা; অবশ্যসম্ভাবীভাবে এক্ষেত্রে নাম আসে জাঁক দেরিদা ও মিশেল ফুকোর।

২.

আপাতত আমরা ফিরে তাকাই বোদলেয়ারে। বোদলেয়ার কীভাবে এলেন বাংলাদেশে? প্রাথমিকভাবে বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত *কবিতা* পত্রিকায় অনূদিত হয়ে এলেন তিনি, কিছুটা প্রকাশিত হলেন *দেশ*-এ, তারপর বই আকারে *শার্ল বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা* নামে তিনি প্রকাশ পান ১৯৬১-তে। বোদলেয়ারের দোভাষী হিসেবে কাজ করলেন কবি বুদ্ধদেব বসু, যদিও তিনি 'বিধিবদ্ধভাবে' ফরাসি ভাষা জানতেন না। তাঁরই মধ্যস্থতায় ফরাসি ভাষার উনিশ শতকের কবি তরঙ্গ তুললেন বিশ শতকের পঞ্চাশ-ষাট দশকের বাংলাদেশের বাংলা কবিতায় – দুই দশকের অনেক কবিই এই কবির নাম নিয়েছেন। বুদ্ধদেব বসুর বোদলেয়ার যে ঢাকা শহরের কবিদের মগজ কাঁপিয়ে দিয়েছিল তা বোঝা যায় বেশ কিছু স্মৃতিচারণমূলক লেখা থেকে। যেমন শামসুর রাহমান বলছেন :

> ...সেই গ্রন্থটি আমরা যাঁরা পঞ্চাশের দশকের কবি বলে চিহ্নিত, তাদের অনেককেই সম্মোহিত করেছিল। এবং আমি মনে করি, পঞ্চাশের দশকের কবিতার যে চেহারা দাঁড়িয়েছে তার কিছু অংশ হয়তো বুদ্ধদেব বসুকৃত সেই অনুবাদগুচ্ছ প্রকাশিত না হলে নির্মিত হত না। এমনকি সেই প্রভাব পঞ্চাশের দশকের কবিদের মধ্য দিয়ে বাহিত হয়ে ষাটের দশকের কবিদেরও স্পর্শ করেছিল। (২০০১ : ১৪)

পঞ্চাশের কবিদের হাত ধরে ষাটে চালিত হয়েছিল কিনা সে প্রশ্ন মুলতবি রাখছি; কেননা ষাটের কবিরা আরও এক কাঠি এগিয়ে, তাঁরা বলেন আরও আবেগমথিতভাবে; যেমন, আসাদ চৌধুরী বলছেন :

> সেই সময়ই, হাতে এলো বুদ্ধদেব বসু অনূদিত 'শার্ল বোদলেয়ার : তার কবিতা'... মুহূর্তেই আমরা পাগল হয়ে গেলাম। বুদ্ধদেব বসু আমাদের কতখানি প্রভাবিত করেছিলেন, 'স্বাক্ষর'-এর গদ্য লেখাগুলো পড়লেই টের পাওয়া যায়। (১৯৮২ : ২৮)

সিকদার আমিনুল হক জানাচ্ছেন :

> ...এই মর্মর অনুবাদগুচ্ছ আধুনিক বাংলা কবিতার জাগরণের প্রথম ও অভূতপূর্ব ঘটনা। যে অনিবার্য পরিবর্তন কাম্য ছিল এতদিন, তাকেই মূর্ত করে তুলেছে এই অনুবাদ – আমার কাছে এবং আমার মতো আরো অনেকের কাছে এই অনুবাদগুচ্ছ তাই এক বিরল ঘটনা। (১৯৯৫ : ১০৪)

বুদ্ধদেব বসুর বোদলেয়রের কাছে ঋণস্বীকার করছেন ষাটের দশকের কবি রফিক আজাদও; তিনি বলছেন :

> আমাদের ঐদিনের আলোচনার কেন্দ্রে ছিলেন স্বয়ং বুদ্ধদেব বসু তাঁর আসাধারণ অনুবাদের জন্যে। তিনি ঐ সময় শার্ল বোদলেয়ারের কবিতার অনুবাদ করছিলেন। বাংলা ভাষার তাবৎ তরুণ কবির মধ্যে তখনই বড় একটা সাড়া পড়ে যায়। বোদলেয়ারের অস্থির, ঝোড়ো জীবন উভয় বাংলায় তরুণদের প্রভাবিত করতে থাকে। বুদ্ধদেব-কৃত বোদলেয়ারের অনুবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয় নি এমন তরুণের দেখা মেলা ভার ছিল।... বোদলেয়রের প্রভাব তখন যেন প্রায় অনিবার্য ছিল, উভয় বাংলার তরুণদের ওপর। (২০০৯ : ১৪৫)
>
> প্রধানত বুদ্ধদেবের অনুবাদে বোদলেয়ারের কবিতা আমাকে আচ্ছন্ন করে রাখে, সর্বক্ষণ।... (২০০৯ : ১৫০)

কবিরা কী কী নিয়েছেন বোদলেয়ারের কাছ থেকে? বুদ্ধদেব বসুর মারফত বাংলাদেশের কবিরা নিলেন দেখবার একটি চোখ, যেই চোখ নিয়েছিলেন বোদলেয়ার-পরবর্তী কবি র‍্যাঁবোও; বুদ্ধদেব তাঁর উল্লেখ করেন এভাবে :

> 'অদৃশ্যকে দেখতে হবে, অশ্রুতকে শুনতে হবে,' 'ইন্দ্রিয়সমূহের বিপুল ও সচেতন বিপর্যয়সাধনের দ্বারা পৌঁছতে হবে অজানায়,' 'জানতে হবে প্রেমের, দুঃখের, উন্মাদনার সবগুলি প্রকরণ,' 'খুঁজতে হবে নিজেকে, সব গরল আত্মসাৎ করে নিতে হবে', 'পেতে হবে অকথ্য যন্ত্রণা, অলৌকিক শক্তি, হ'তে হবে মহারোগী, মহাদুর্জন, পরম নারকীয়, জ্ঞানীর শিরোমণি। আর এমনি ক'রে আজানায় পৌঁছনো! (বুদ্ধদেব বসু : ১৯৮৮)

বোদলেয়রের ব্যবহৃত সূত্রগুলোর সরল তালিকায় বুদ্ধদেব যা যা রেখেছেন, সেগুলো হলো : 'আত্মসন্ধান, অত্মপরীক্ষা; দুঃখ, রোগ, মত্ততা; ইন্দ্রিয়সমূহের অতীন্দ্রিয় বিনিময়'। (বুদ্ধদেব বসু : ১৯৮৮)। আধুনিক বাংলা কবিতার অন্যতম এই পুরোহিত বোদলেয়ারের ভাষ্য তৈরি করতে গিয়ে রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গিরও একটি সংজ্ঞার্থ হাজির করলেন, যেটি বাংলাদেশের কবিদের মর্মমূলে গেঁথে গেছে; বুদ্ধদেব বলেন :

> তারই নাম রোমান্টিকতা, যা ব্যক্তি-মানুষকে মুক্তি দান করে, স্বীকার করে নেয় – শুধু ইস্ত্রি-করা এটিকেট-মানা সামাজিক জীবটিকে নয়, নির্ভয়ে মানুষের অবিকল ও সমগ্র ব্যক্তিত্বকে; তার মধ্যে যা-কিছু অযৌক্তিক বা যুক্তির অতীত, অনিশ্চিত, অবৈধ, অন্ধকার ও রহস্যময়, যা-কিছু গোপন, পাপোন্মুখ ও অকথ্য, যা-কিছু গোপন, ঐশ্বরিক ও অনির্বচনীয় – সেই বিশাল ও স্বতোবিরোধময় বিস্ময়ের সামনে, সন্দেহ নেই, মুখোমুখি দাঁড়াবার শক্তির নামই রোমান্টিকতা। (বুদ্ধদেব বসু ১৯৮৮ : ৪-৫)

বুদ্ধদেব বসুর বোদলেয়ার ও আধুনিক কবিতাকেন্দ্রিক এই ভূমিকাটিতে মিশে আছেন দু'জন : বোদলেয়র ও বুদ্ধদেব বসু; বুদ্ধদেব বোদলেয়রের সেটুকুই তিনি বিশেষভাবে গ্রহণ করেছেন, আধুনিক ও রোমান্টিক কবিতার ক্ষেত্রে যেটুকু তিনি মানেন বা বিশ্বাস করেন। *কবিতা* পত্রিকার সূত্রে বাংলাদেশের কবিদের সামনে আধুনিকতার মান বা আদর্শ হয়ে উঠেছিল বুদ্ধদেব বসুর চিন্তা ও কর্মকাণ্ডগুলো। ফলে কবিতা পত্রিকায় এবং পরবর্তীকালে বই আকারে যখন বোদলেয়র প্রকাশিত হলেন এবং সেই বইতেই যখন তৈরি হলো আধুনিক কবিতার সূত্রগুলো, তখন বাংলাদেশের তরুণ কবিরা লুফে নিলেন। শামসুর রাহমান, সৈয়দ শামসুল হক, শহীদ কাদরী, রফিক আজাদ, আবদুল মান্নান সৈয়দ, সিকদার আমিনুল হকের কবিতায় প্রভাব ফেললেন কবি অনূদিত বোদলেয়র। পঞ্চাশের কবিদের বোদলেয়ার পরিগ্রহণ সংঘবদ্ধ নয়; কিন্তু ষাটের কবিরা সংঘবদ্ধভাবে বোদলেয়র-মগ্নতার চিহ্ন রাখলেন ছোটকাগজের পাতায়; 'প্রতিষ্ঠান', 'নিয়ম', 'মান' ইত্যাদির বিরুদ্ধে সরব প্রতিবাদ হিসেবে কবিরা ব্যবহার করতে চাইলেন 'ধ্বংস', 'পাপ', 'অযুক্তি', 'অন্ধকার'কে। অনূদিত বোদলেয়রের ভাব ও ভাষা হয়ে উঠল কবিদের অন্তিম আরাধ্য। ষাটের দশকের একদল লেখক *কণ্ঠস্বর* পত্রিকার ইস্তেহারে লিখছেন :

> যারা সাহিত্যের সনিষ্ঠ প্রেমিক, যারা শিল্পে উন্মোচিত, সৎ, অপকট, রক্তাক্ত, শব্দতাড়িত, যন্ত্রণকাতর; যাঁরা উন্মাদ, অপচয়ী, বিকারগ্রস্ত, অসন্তুষ্ট, বিবরবাসী; যারা তরুণ, প্রতিভাবান, অপ্রতিষ্ঠিত, শ্রদ্ধাশীল, অনুপ্রাণিত; যারা পঙ্গু, অহংকারী, যৌনতাস্পৃষ্ট কণ্ঠস্বর তাদেরই পত্রিকা। (আবদুল মান্নান সৈয়দ ১৯৮৯ : ৪৬)

স্যাডজেনারেশনের ছোট্ট ইস্তেহারটিতেও বোদলেয়ারের প্রতিধ্বনি শোনা গেল। মূলত পঞ্চাশ-ষাট দশকের কবিদের কবিতায় বোদলেয়ার একটি নতুন ভাষা হিসেবে অবির্ভূত হলেন। তাঁর আঁকা প্যারিস, সন্ধ্যা, মধ্যরাত, সুন্দর-অসুন্দরের দ্বন্দ্ব, উন্মাদনা, পাতকীরূপী নারী, নারীর বাঘিনী বা বিড়ালপ্রতিমা, গণিকা, রেঁস্তোরা, ঈশ্বর-ভগবানের বিরোধ – এই সব কাব্য-উপাদান ও সামাজিক পটভূমি কবিতা রূপে হাজির হল বাংলাদেশের কবিতায়। আমরা দু-একটি

উদাহরণ হাজির করতে চাই – যেমন, বোদলেয়ারের *প্যারিস-সপ্লীন*-এর প্রথম কবিতা 'অচেনা মানুষ :

বলো অমাকে, রহস্যময় মানুষ, কাকে তুমি সবচেয়ে ভালোবাসো :
তোমার পিতা, মাতা, ভ্রাতা, অথবা ভগ্নীকে?
পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী – কিছুই নেই আমার।
তোমার বন্ধুরা?
ঐ শব্দের অর্থ আমি কখনো জানিনি।
তোমার দেশ?
জানিনা কোন দ্রাঘিমায় তার অবস্থান।
সৌন্দর্য?
পারতাম বটে তাকে ভালোবাসতে – দেবী তিনি, অমরা।
কাঞ্চন?
ঘৃণা করি কাঞ্চন, যেমন তোমরা ঘৃণা করো ভগবানকে।
বলো তবে, অদ্ভুত অচেনা মানুষ, কী ভালোবাসো তুমি?
আমি ভালোবাসি মেঘ...চলিষ্ণু মেঘ...ঐ উঁচুতে...ঐ উঁচুতে...
আমি ভালোবাসি আশ্চর্য মেঘদল!

একে একে পিতা-মাতা, আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু, সৌন্দর্য – সবকিছুর প্রতি অস্বীকৃতি জানিয়ে ভালোবাসা নিবেদন করেছে 'আশ্চর্য মেঘদলের প্রতি'। পরিজনহীন, বন্ধু-ব্যতিরেকী 'অদ্ভুত অচেনা মানুষ' হয়ে ওঠবার এই বোধটি বাংলাদেশের কবিতায় তীব্রভাবে এল। রফিক আজাদ যেমন 'কুয়াশার চাষ' কবিতায় বলছেন :

আমার আত্মীয়-পরিজন ব'লে দাবি করে যারা
এবং আমার পরিচিত বন্ধবান্ধবেরা
আমাকে ডাকবে নাম ধ'রে – উত্তরও পাবে তারা,
বলবো : 'এই তো আছি; দাঁড়িয়ে রয়েছি তোমাদের
মুখোমুখি, এইখানে।' আমার কণ্ঠ ও কথা তারা
শুনে যাবে, তবু দেখবে না শুধু আমাকেই –
নিকটে থেকেও আমি সহস্র মাইল ব্যবধানে
আজীবন সকলের দৃষ্টির আড়ালে র'য়ে যাবো –

নিয়ত নির্দিষ্ট স্থানে স্পর্শাতীত, গোপন বাগানে।

অনূদিত বোদলেয়রের পাঠ এত ব্যাপকতর হলো যে, বোদলেয়ারের জীবন সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসু যে-টীকাভাষ্য ও বিবরণ লিখেছিলেন তারও কিছু শব্দ ও শব্দাংশ বাংলাদেশের তরুণ কবিদের কবিতায় 'ভাষা-উপাদান' হিসেবে জায়গা করে নিল। এমনকি কবি বোদলেয়র নিজেও হয়ে উঠলেন কবিতার বিষয়; শামসুর রাহমানের বিভিন্ন কবিতায় ঘুরে ফিরে এসেছে বোদলেয়ার-প্রসঙ্গ – কখনো ব্যক্তি হিসেবে, কখনো পাঠের অভিজ্ঞতা হিসেবে। 'আমি কি পারবো?' শিরোনামের সনেটে শামসুর রাহমান ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে তুলনা করছেন বোদলেয়রের :

নেমেছে অসিত নম্র ডানা মেলে নিশীথ নিঝুম
চৌদিকে এবং বাতিজ্বলা ছোট আমার এ-ঘরে
স্তব্ধতা ঘুমন্ত বেড়ালের মতো গাঢ় আছে প'ড়ে,
রয়েছে চেয়ারে বসে বহুক্ষণ, চোখে নেই ঘুম
হাতে প্রস্ফুটিত বোদলেয়ারের ক্লেদজ কুসুম।
মনে পড়ে, নিঃসঙ্গ অসুস্থ কবি প্রহরে প্রহরে
হেঁটেছেন কৃষ্ণ বেশে। তাঁরই মতো আমিও শহরে
একা একা ঘুরি নিয়ে অস্তিত্বে ব্যাধির গুপ্ত ধূম। (১৯৯৯ : ১৬০)

রফিক আজাদের কবিতায় এক কবিকে দেখতে পাচ্ছি 'আনন্দিত পাপে অধঃপাতে' ডুবে যাওয়া 'রূপসী শব্দের যাদুকর' হিসেবে; মসজিদ থেকে ভেসে আসা 'বিমুগ্ধ প্রার্থনা'র শব্দে আলোড়িত হলেও এই কবি সম্বন্ধে 'লোকেরা জানে,/ লাম্পট্যে সে মুঘল সম্রাট, নির্বিবেক বদমাশ,/ ঘৃণ্য গণিকালয়ের সন্ত!' বোদলেয়ার প্রসঙ্গে 'গণিকালয়ের সন্ত' অভিধাটি কিন্তু বুদ্ধদেব বসুরই দেয়া। শহীদ কাদরী লিখেছেন, 'একবার শার্ল বদলেয়ার প্রেরিত এক পিপে সুরা আমি/ পেয়েছিলাম কৈশোরে পা রেখে।' বোদলেয়ারের এই সুরা পঞ্চাশ-ষাটের কবিদের কবিতায় উপচে পড়েছিল; বক্তব্য, প্রসঙ্গ এবং ভাষাকাঠামো দ্বারা-প্রভাবিত হয়েছিলেন কবির। কাদরী প্রভাবের প্রসঙ্গটি এড়িয়ে গেলেও স্বীকার করেছেন প্রথম তারুণ্যের আচ্ছন্নতা। কিন্তু এই বোদলেয়ার কতোটা কবি 'বোদলেয়ার' নিজে? অরুণ মিত্র এ-ধরনের কিছু প্রশ্ন সামনে নিয়ে সমালোচনা করেছেন বুদ্ধদেব বসুকৃত অনুবাদের, দেখিয়েছেন বুদ্ধদেব অনেকটাই মূল থেকে সরে গিয়ে পুনর্সৃজন করেছেন। তারুণ্যের মুগ্ধতা কাটিয়ে অনেকেই পরবর্তীকালে মেনে নিয়েছেন, বুদ্ধদেব বসুর বোদলেয়ার অনেকটাই বুদ্ধদেবের নিজস্ব বোদলেয়ার। সৈয়দ শামসুল হক যেমন বলেন :

আমারা ফরাসী ভাষাজ্ঞান খুব সামান্য হলেও তাঁর মূল রচনার সঙ্গে বুদ্ধদেবের অনুবাদ মিলিয়ে দেখবার দুঃসাহস একদা দীর্ঘ ইউরোপ প্রবাসকালে করেছিলাম এবং আবিষ্কার করেছিলাম যে, বুদ্ধদেবের 'ক্লেদজ কুসুম' যতখানি বোদলেয়ারের অনুবাদ ততখানিই বুদ্ধদেবের নিজের রচনা;... (১৯৯৭ : ২৬৩)

৩.

বাংলাদেশের তরুণ কবিদের আরাধ্য হয়ে উঠেছিলেন আরও একজন ফরাসি কবি – তিনি র‍্যাঁবো। যদিও বঙ্গদেশে বই হিসেবে র‍্যাঁবোর প্রকাশ বোদলেয়রের বেশ কয়েক বছর আগে। *নরকে এক ঋতু* নামে লোকনাথ ভট্টাচার্যের হাতে র‍্যাঁবো অনূদিত হন ১৯৫৪-তে – র‍্যাঁবোর জন্মশতবর্ষে। স্বল্পায়ু এই কবির কবিতা দাদাবাদী, পরাবাস্তবতাবাদী কবিতা থেকে চিত্রকলা পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। ষাটের দশকের বাংলাদেশে অন্তত দু'জন কবিকে সনাক্ত করা যায়, যাঁদের কবিতা র‍্যাঁবোর জগতে পরিভ্রমণের স্বাক্ষর বহন করে; তাঁরা দুজন – আবদুল মান্নান সৈয়দ ও সিকদার আমিনুল হক। র‍্যাঁবোর কাছ থেকে ভাবগতভাবে তাঁরা নিলেন অন্তর্দীপ্তি আর আত্ম-উন্মোচনের স্বভাব, কবিতার ডিকশনের জায়গা থেকে নিলেন টানাগদ্যের চেহারা। র‍্যাবোর *নরকে এক ঋতু*র কবিতাগুলো যেন পুনরুচ্চারিত হলো এঁদের কবিতায়। আবদুল মান্নান সৈয়দের *জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ* বইতে, সিকদার আমিনুল হকের *সতত ডানার মানুষ*, এমনকি তাঁর *বাতাসের সঙ্গে আলাপ* বইতেও গাঁথা আছে র‍্যাঁবোর চিহ্ন।

র‍্যাঁবোর *নরকে এক ঋতুতে* পাওয়া যায় এমন এক তরুণকে, যিনি বিষণ্ন ও উচ্ছ্বসিত, ক্রোধী ও উন্মত্ত – সমকালের বিরুদ্ধে যাঁর প্রবল ক্ষোভ। কিন্তু জীবন মন্থন করে কিছু একটা চাই তাঁর – কী সেই চাওয়া? কোথায় সেই দীপ্তি? সেই-বা কে? আশ্চর্য সব প্রশ্নমালার জবাব যেন খুঁজে ফিরেছিলেন র‍্যাঁবো – হতাশা, দুঃখবোধ, বিষাদ ভরপুর জীবনের অর্থ ও অনর্থ :

মন থেকে মানুষী আশার সমস্ত মুকুল নির্মূল ক'রে দিলাম। হিংস্র পশুর মতো চতুর উল্লম্ফনে গলা টিপে ধরলাম প্রতিটি আনন্দের।

ডাকলাম জল্লাদদের, মরবার আগে তাদের খাঁড়ার বাঁট কামড়ে ধরবো ব'লে – জড়ো করলাম জাঁতার কল, তারা যেন দ'লে পিষে গুড়িয়ে দিতে পারে আমায় বালুর সঙ্গে, রক্তের সঙ্গে।

সিকদার আমিনুল হক লিখছেন :

কিন্তু জীবন আমাদের সরিয়ে দিলো। যে – জীবনকে শুধু ক্ষমা করা যায় সার্থকতার খাতিরে। কিন্তু সবাই কি আমরা তাই? আজও পর্যন্ত আমার হলো না একটি পাথর বসানো সোনার আঙটি।

> কারু কারু ক্রোধ আমার স্নিগ্ধতাকে মান্য করে না। পৃথিবীর আশ্চর্য সুন্দর যে ছন্দ, মখমলের মত নরম যে নিঃসঙ্গতা; তাও ওদের আনন্দ দেয় না।
>
> ...
>
> ভাইদের থেকে যখন বিচ্ছিন্ন হয়, তখনই মানুষ প্রথম পৃথিবীর ফাঁদে পা দেয়; আর তখুনি জন্ম নেয় প্রথম স্বাধীনতার আশ্চর্য প্রহর!

সতত ডানার মানুষ বইতেও যেন সেই তরুণের উন্মূল, হতাশ, বাসনাবিলাসী তরুণের আবির্ভাব ঘটেছে। আপন শৈশব ও ব্যক্তিগত ইতিহাস খুঁড়ে যে দেখে কেবলই বিষাদ আর বিচ্ছিন্নতা। আগাগোড়া টানা গদ্যে লেখা *সতত ডানার মানুষ* বইতে ফরাসি কবিতার ছাপ পড়েছিল সে বিষয়ে সিকদার আমিনুল হকের নিজেই বলেছেন, '*সতত ডানার মানুষ* মূলত ফরাসী কাব্যধারার মতো। ফরাসী কবিরা এই ধরনের গদ্যকে আশ্রয় করে কবিতা লেখেন।' (সিকদার আমিনুল হক ২০০৪ : ১৫১)। প্রেরণা হিসেব এক্ষেত্রে তিনি অবশ্য র‍্যাঁবোর নাম নেননি, 'টানা গদ্য' বা 'প্রকরণে'র জন্য নিয়েছেন সাঁজ পাখস এবং জুল লাফোখের নাম।

৪.

বাংলাদেশের কাব্যভাষায় আরও এক ফরাসি ঋণ পরাবাস্তবতাবাদ। এর উদ্ভবের সঙ্গে যদিও ইউরোপের নানা শহরের অনেক সন্ধ্যা আর রাত্রির বৃত্তান্ত জড়িয়ে; তবু প্যারিসের কথা বিশেষভাবেই বলতে হয়। আঁদ্রে ব্রেতো, ত্রিস্তা জাঁরা, লুই আরাগঁ, পল এল্যুয়ার এ-শহরে সমাগত যুক্তি ও প্রথাবিরোধী নতুন শিল্পতত্ত্ব নিয়ে, রচিত হল দাদাবাদী ও পরাবাস্তবতাবাদী কবিতার ইস্তেহার। ইস্তেহার থেকে ইস্তেহারে, গোষ্ঠী থেকে গোষ্ঠীতে বিভক্তিও চলেছে বহুবার। সেই ঢেউ বাংলাদেশে এসেছে পঞ্চাশ-ষাটের দশকে।

বাংলাদেশে পরাবাস্তবতাবাদী কাব্যভাষা মুখ্য মাধ্যম রূপে এল না; কিন্তু অচিরেই হয়ে উঠল কবিতার একটি ভাষা। শামসুর রাহমান বা আল মাহমুদ বা শহীদ কাদরীর কবিতায় পরাবাস্তব রীতির পংক্তির দেখা মিললেও তাঁরা কেউই আমূলভাবে এই ঘরানার কবি নন। এ-ধারার প্রথম বিস্ফোরণ আবদুল মান্নান সৈয়দের *জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ*। মান্নানের দাবি অবশ্য অন্যরকম, *আমার বিশ্বাস* বইতে তিনি জানান, *জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ* লেখার আগে তিনি এই শিল্পান্দোলন সম্পর্কে বিন্দু-বিসর্গও জানতেন না। জানার সে অর্থে দরকারও ছিল না, কেননা ওই রীতিটি দেশি-বিদেশি পূর্বজ অনেক কবির ভাষায়ই বিদ্যমান।

মান্নান তাত্ত্বিক তৎপরতার সাথে প্রকাশ করেন *পরাবাস্তব কবিতা* (১৯৮২) নামের একটি বই। নিজের মৌলিক কবিতার পাশাপাশি এ-বইতে তিনি জুড়ে দিয়েছেন পরাবাস্তবতাবাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, চিত্রকলা ও বিভাষী চার জন কবির কবিতার অনুবাদ। মান্নানের বিবেচনায় পরাবাস্তবতাবাদ 'ভেঙে দিয়েছিলো ঐতিহ্যগত শব্দ আর অর্থের ব্যকরণিক সম্বন্ধ এবং আবিষ্কার করেছিলো শব্দের প্রতীকী চরিত্র।' (১৯৮২)। বংলাদেশে মান্নান সৈয়দই সম্ভবত ষাটের একমাত্র কবি যিনি কবিতা লেখার সমান্তরালে কাব্য-আন্দোলনগুলোর ইতিবৃত্তও রচনা করেছেন। দাদাবাদ, পরাবাস্তবতাবাদ, প্রতীকবাদের ওপর তাঁর গদ্য চোখে পড়ে। তথ্য হিসেবে এটুকু জানা জরুরি এই জন্যে যে, ফরাসি কাব্য ও চিত্র-আন্দোলনের সঙ্গে কবি ও কবিতার এই সম্পৃক্তি কবিদের তাত্ত্বিক সচেতনতার নকশাগুলোকে স্পষ্ট করে দেয়। পরাবাস্তবতাবাদী কাব্যভাষার অবিরল প্রয়োগ দেখতে পাই মান্নান সৈয়দের সমকালীন রফিক আজাদ, হুমায়ুন আজাদ, সিকদার আমিনুল হক প্রমুখের কবিতায়। যদিও প্রত্যেকেরই কাব্যভাষার গুণগত পার্থক্য ও বৈচিত্র্য বিদ্যমান।

৫.

বোদলেয়ার, র‍্যাঁবো, প্রতীকবাদ ও পরাবাস্তবতাবাদের মোড় পেরিয়ে ষাটের কবিতায় পৌঁছলে এবং বাঙালির জাতীয়তাবাদী আবেগের অংশটুকু উহ্য রাখলে দেখা যাবে, বাংলাদেশের কবিতা প্রধানত অবক্ষয়বাদের স্তবগানে মুখর। 'আত্ম' সীমাবদ্ধ 'আত্মকেন্দ্রিকতা'য়। মধ্যবিত্তের দ্বিধাদোদুল জীবনচরিতের বাইরে তাঁদের দেখা মূলত ট্রেনের জানলা দিয়ে বহির্দৃশ্য দেখার মতোন। কিন্তু কেন এই নেতিবাচকতায় সমপর্ণ? অবক্ষয়ের প্রতি ঝোঁক? কেন এই আত্মকণ্ডুয়ন অথবা আত্মবিস্ফার?

কবি আর সমালোচকেরা মিলে এর যুক্তি খোঁজেন তৎকালীন পূর্ব বাংলার সমাজ, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে। তাঁদের ভাষ্যে, যেহেতু পঞ্চাশ ষাটের দশকে এ-দেশ পাকিস্তানের অভ্যন্তরীন ঔপনিবেশিক শাসনের শিকার, যেহেতু এই দেশ গন্তব্যবিহীন রাজনৈতিক ডামাডোলের ভেতর মজ্জমান, সেহেতু নেতি, নিরর্থকতা, অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই তাঁদের আরাধ্য হল না। আর তাই বাংলাদেশের কবিতায় অবক্ষয়বাদই হয়ে উঠল অদ্বিতীয় সত্য। ফরাসি কবিতার বর্ণগন্ধ করতলে নিয়ে কবিরা যা লিখলেন তা পূর্ব বাংলার সত্যের এক পিঠ হাজির করল। কিন্তু অপর পিঠে কী আছে?

নিশ্চয়ই পঞ্চাশ-ষাট দশকের বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রতিবাদ, আশাবাদ আর গন্তব্যও তৈরি হচ্ছিল। গড়ে উঠেছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক ছক। মজার ব্যাপার, উচ্ছ্বাসময় তারুণ্যে ষাটের কবিরা কিন্তু এই ছকটির ধারে কাছে দিয়েও ঘেঁষলেন না। অন্তত তাঁদের প্রথম বইতে তার কোনো স্বাক্ষর-চিহ্ন নজরে পড়বে না। পরবর্তী কালে তাঁদের কেউ কেউ 'ভাত দে হারামজাদা'-ধরনের রাজনৈতিক উগ্রচণ্ডা ভাষ্যকার হলেও সাধারণভাবে তাঁরা ছিলেন আত্মতরঙ্গে ভাসমান। তাঁরা হয়তো যুক্তি খুঁজেছেন 'বাস্তবে'র 'পরাবাস্তব' উপস্থাপনায়। আর তাই তাঁদের প্রথম বইতে পাওয়া যাচ্ছে আত্মবিবরবাসী মধ্যবিত্তের চিৎকার ও সংবেদনা। ঘরের বাইরে সংস্কৃতি ও রাজনীতির যে-রূপান্তর ঘটছে তা নিয়ে কবিরা তেমন উৎসাহী নন।

৬.

ফরাসি কবিতায় বোদলেয়র, র‍্যাঁবো, প্রতীকবাদ ও পরাবাস্তবতাবাদ যেমন একটি খাত, তেমনি আরেকটি খাত তৈরি হয়েছিল লুই আরাগঁ, পল এল্যুয়ার বা এইমে সেজায়ারের সূত্রে। এই খাতটি প্রতিবাদী ও ইতিবাচক সমাজ রূপান্তরে আগ্রহী। প্রথম দিকে আরাগঁ ও এল্যুয়ার পরাবাস্তবাদী কাব্য-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও পরবর্তী কালে মার্কসবাদী রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয় হয়ে ওঠেন তাঁরা, যদিও তাঁদের কাব্যভাষা থেকে পরাবাস্তব কৌশলগুলো উধাও হয়ে যায় না। ফরাসি দেশে পড়াশোনা করা, প্যারিসের ক্যাফেতে বসে পরাবাস্তব কবিতার ইস্তেহার পড়া কবি এইমে সেজায়ার কিন্তু অন্যরকমভাবে এই কাব্য-আন্দোলনকে বুঝতে চাইলেন। তাঁর কবিতায় পরাবাস্তবতার অনুষঙ্গী হয়ে এল তাঁর ক্রীতদাস পূর্বপ্রজন্মের অতীত, বর্ণবাদ, কৃষ্ণত্ব, ঔপনিবেশিক অভিজ্ঞতার বৃত্তান্ত। সুদেষ্ণা চক্রবর্তী বলেন, 'বশ্যতার প্রতীক রূপে শেখা ভাষা পরিণত হয়েছিল বিদ্রোহের অস্ত্রে।...ফ্রাঙ্কোফোন নিগ্রিটিউডের কবিতা গড়ে উঠেছিল ফ্যাননের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিপ্লবের রূপরেখা ও আলজিরিয়ার মুক্তিযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে।' (১৯৯৭)। বোদলেয়রের অর্থে সর্বপ্লাবী না হলেও বাংলাদেশের কবিতায় এই ফরাসি তরঙ্গটি এল অনেক পরে – মুক্তিযুদ্ধের পর। জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও মুক্তিসংগ্রামের অভিজ্ঞতা থেকে দেশজ আধুনিকতার একটি পাঠ তৈরি করতে চেয়েছিলেন কবিরা। এর সঙ্গে মিশেছিল প্রগতিবাদী মার্কসবাদী রাজনৈতিক ভাবনা।

সত্তরের দশকে *কালপুরুষ* নামের ক্ষীণায়ু পত্রিকাটি অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে জানান দিয়েছিল প্রত্যাখ্যানের ভাষা। 'প্রথম বিপ্লবের খুন বেরুবে ভাষা থেকে' শিরোনামের সম্পাদকীয়তে তাঁরা

বলছেন, 'প্রত্যয় প্রতীক, শব্দ, বাক্য এবং বিভিন্ন জ্ঞানকলার শ্রেণীবিন্যস্ত-সমাজের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাহ চলতে থাকবে।' (রফিক নওশাদ ১৯৭২)। এমনকি অবক্ষয়বাদের দূর্গ সেই *কণ্ঠস্বর* পত্রিকাতেই মোহাম্মদ রফিক লিখছেন, 'আর এই বিচূর্ণিত ও বিপন্ন চেতনাকে একত্রিত করবার জন্যে আমাদের মৌলানুভূতির রাজ্যকে হৃদয়ের কারাগার থেকে মুক্ত করে দিতে হ'বে, যে কারাগারে কবিতার আঙ্গিক বা টেকনিকের নামে ধোঁয়াটে ও অসার মন্তব্য করে এদেরকে বন্দী করে রাখা হয়েছে। একমাত্র এই অনুভূতির মাধ্যমেই মিলে যাবে সমস্ত জীবন যার ছায়া পড়বে সাতিত্যে, শিল্পে, বেঁচে উঠবে কবিতা, মানুষের ধমনীর রক্ত হবে চঞ্চল।' (১৯৭২)। ফলে ফরাসি চৈতন্যের সঙ্গে দৈনন্দিন বসবাস সত্ত্বেও মার্তিনিকের কবি এইমে সেজায়ার যেমন লেখেন *Returen to my Native Land*, তেমনি মোহাম্মদ রফিক লেখেন *কপিলা*, *কীর্তিনাশা* বা *গাওদিয়া*র মতো কাব্যগ্রন্থ।

সেজায়ারের দীর্ঘকবিতাটি যুক্তির সিঁড়ি ভেঙে গড়ে ওঠা কোনো ইমারত নয়। পরাবাস্তব কুহকমাখা ভাষা যেমন তাঁর সঙ্গী, তেমনি সঙ্গী ক্যারিবীয়-অফ্রিকীয় বাক্‌বিধি, বিশ্বাস, লোককৃতি, বাচন ও দর্শন – গদ্য-পদ্যের এক বিমিশ্র উচ্চারণ। ভাষা ক্রেওল হলেও সেজায়ার লিখেছেন ফরাসি; লিওপোল্ড সেঁদর সেজ্ঘরকে নিয়ে সেজায়ার গড়ে তুলেছিলেন কৃষ্ণত্ববাদী আন্দোলন। নিউইয়র্কের হার্লেমে কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকানদের সাংস্কৃতিক তৎপরতায় ছড়িয়ে পড়া 'হার্লেম রেনেসাঁ'র হাওয়া লেগেছিল ফ্রাঙ্কোফোন আফ্রিকায় – যাঁরা চেয়েছিল পূর্বসূরিদের মহাদেশের পুনরুদ্ধার। সেজায়ার 'সভ্যতা', 'আধুনিকতা' এই সব ভাবপ্রপঞ্চের গভীরে দেখেছেন নির্যাতনের মারণমন্ত্র, লিখছেন :

> For centuries this country repeated that we are brute
> beasts; that the human hearth-beat stops at the gates of
> the black world; that we are walking manure hideously
> proffering the promise of tender cane and silky cotton,
> and they branded us with red-hot irons and we slept in
> our shit and we were sold in public squares and a yard
> of English cloth and salted Irish meat were cheaper than
> us and this country was quiet, calm, saying that the
> spirit of God was in His acts.

আমাদের দেশের পঞ্চাশ বা ষাটের দশকের কবিরা এ-রকম প্রতিবাদমুখর কোনো সাহিত্য-আন্দোলনের জন্ম দেন নি, বরং সাহিত্যের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্কটিকে এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন। কেননা কবিদের বড় একটি অংশ ফিরে গেছেন সেই পুরনো তরিকায় 'শিল্পের জন্য শিল্প' – এই বিশ্বাসে। কিন্তু কারো কারো শিল্পচিন্তায় ঔপনিবেশিক ও আধুনিকতাবাদী সাহিত্যের স্বদেশমৃত্তিকামূল ছেড়ে যাবার সমালোচনা আছে। মোহাম্মদ রফিক এ-ধারার স্বল্পসংখ্যক কবির একজন, যাঁর কবিতায় দেখতে পাচ্ছি সেই দেশ সেই ভূখণ্ড যেটি ঔপনিবেশিক যাঁতাকলে পিষ্ট আবার উপনিবেশ-উত্তর রাজনৈতিক নিষ্পেষণের শিকার। ফলে বাস্তব ও পরাবাস্তবের দোটানায় মোহাম্মদ রফিক এঁকে দেখান ভাঙাচোরা বিষণ্ন বাংলাদেশের মুখ। *গাওদিয়া* ও *কপিলা* থেকে কিছু কাব্যপঙক্তি :

অকালে বিধবা পিসি, ভাজা পুলি, ধূমল সুস্বাদ,
দুয়োরানী, চিতায় চন্দন কাঠ, গাঙুড়ের জলে
ভাসে ভেলা, নিদ্রার নিশ্ছিদ্র পথে ঢুকে পড়ে সাপ
এই সুখে ফণায় ফণায় বিষে জ্বলে ওঠে মণি,
কলাবতী রাজকন্যে স্বপ্ন দেখে হাসির বেঘোরে,...
('বসন', গাওদিয়া/৪২)

এই সব
বেদবাক্য শুধুমাত্র আমাদের ভদ্রমুখে ভদ্রতা,
এই জন্যে বিদেশের কারখানায় প্রস্তুত এসেন্স
সাম্যবাদ মানবিক অধিকার গণতন্ত্র দ্যাখ্‌
আজব স্বদেশী যন্ত্রে সংস্করণ প্রস্তুত করেছি,
হারামীরা তড়পানো থামা,...
(*কপিলা*/১২০)

বিপ্লবে
বিপ্লবে উত্তোলিত হাত দাঁতেদাঁত কামড়ে উত্তেজিত
পড়ে থাকা মাটি...জরা
খালেকের বেতো বউ জুরুর কপালে
কবিতার কালসিটে স্পষ্ট গাঢ় বিরাট অক্ষরে

ক্ষুধা/মৃত্যু/মৃত্যু/ক্ষুধা

রঙ্গিলা নায়ের মাঝি ভাটির নদীতে যাও বাইয়া...ক্ষুধা
বাওকুংটা বাতাস যেমন মরে ঘুরিয়া...জরা
ফান্দেতে পড়িয়া বগা বন্দী হইরো ধর্লা নদীপাড়ে...মৃত্যু
খানকীমাগী স্বভাব যেমন ধরা পাঁচ টংকা স্বামী...ছায়া...
(*কপিলা*/১৪৬)

৭.

পঞ্চাশ-ষাটের পর বাংলাদেশের কবিতায় আর কোনো বিশেষ ফরাসি কবিনাম বা বিশিষ্ট কোনো কাব্য-আন্দোলন উদ্দীপক আকারে দেখা দেয় নি। আশি ও নব্বই দশকের কবিতায় বরং ভাবগত উদ্দীপনা যুগিয়েছেন বেশ কয়েকজন ফরাসি দার্শনিক ও তাত্ত্বিক – যেমন, জাঁক দেরিদা ও মিশেল ফুকো। ঔপনিবেশিক নন্দনতাত্ত্বিক অভিজ্ঞতার ঝুলি ঝেড়ে ভূমিজ বয়ানের খোঁজে কোনো কোনো কবি দেরিদার বিনির্মাণবাদ বিষয়ক ধারণার প্রয়োগ ঘটাতে চেয়েছেন। উত্তর-আধুনিক কবিতার ভাষাগত নিরীক্ষার ক্ষেত্রে দেরিদার ভাষা-বিষয়ক ধারণাকে কাজে লাগিয়েছেন কেউ কেউ। দেরিদা পাঠের অভিজ্ঞতা থেকে কারো কারো ইচ্ছে কবিতায় ব্যবহৃত শব্দের অর্থের বহুতলাশ্রয়ী মুক্ত সম্ভাবনা তৈরি করা।

একইভাবে ফুকোর প্রতি তাত্ত্বিক ঝোঁক কোনো কোনো কবির বিশ্ববীক্ষায় প্রভাব ফেলেছে সন্দেহ নেই। সাহিত্যের আধুনিকতা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির সম্বন্ধ, সমাজ ও ক্ষমতা-ভাষ্য ইত্যাদির বোঝাপড়ায় ফুকো অন্যতম প্রেরণা। ফলে আশি-নব্বই দশকের ছোটকাগজ আন্দোলনে ষাটের দশকের অবক্ষয়বাদী আন্দোলনের প্রকোপ কমেছে, একই সঙ্গে ইউরোপীয় আধুনিকতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধী ও প্রশ্নাত্মক অবস্থান তৈরি হয়েছে। ১৯৯৪-এ *একবিংশ* পত্রিকায় সালাহউদ্দীন আইয়ুব লিখছেন আধুনিকতার সংকট বিষয়ে; বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে চর্চিত উত্তরাধুনিক চিন্তার টানাপড়েন আর গলদগুলোও সনাক্ত করেছেন তিনি। উভয় ক্ষেত্রে তাঁর ভাবনার উৎস ফরাসি তাত্ত্বিকগণ – জাঁ-ফ্রাসোয় লিওতার, জাঁক দেরিদা, মিশেল ফুকো ও রোলা বার্থ। লিওতারের মেটান্যারেটিভ-বিরোধিতা, দেরিদার ‘প্লেফুলনেস’ ও ‘আদার’, বার্থের ‘টেক্সট’-সংক্রান্ত ভাবনা এবং ফুকোর ইতিহাসহীনতাকেন্দ্রিক বক্তব্যের আলোকে আইয়ুব উত্তরাধুনিকতাকে বুঝতে চান। তিনি লিখেছেন :

> পশ্চিমের উত্তরাধুনিক ভাবুকেরা নিজেদের আবহমান আধুনিকতা বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, সেই প্রশ্ন অন্তঃসারপূর্ণ, গভীর, অন্তর্দশী। জাঁ ফ্রাসোয়া লিওতার প্রথম যখন 'দি পোস্টমডার্ন কন্ডিশন' (১৯৮৪) বইটি লেখেন, তখন কেউই গা করেনি। কিন্তু পরে পশ্চিমের সমস্ত ভাবুককে লিওতারের বক্তব্য নাড়া দিয়েছে, সমাজবিশ্লেষক-স্থাপত্যশিল্পী-কবি-রাজনীতিতাত্ত্বিক-বুদ্ধিজীবী-সমালোচক সবাই এ বইয়ের বক্তব্য যাচাই করে দেখেছেন, তর্কে লিপ্ত হয়েছেন। (১৯৯৪ : ১০৭)

আইয়ুবও যাচাই করে বুঝে নিতে চান আধুনিকতা ও উত্তরাধুনিকতার স্বভাব। তবে তা পশ্চিমবঙ্গের ভাবুকদের কাছ থেকে নয়, বরং উত্তরাধুনিকতার উৎসে যে-ভাবুকগণ করেছেন তাঁদের লেখার সূত্রে। নব্বইয়ের তরুণরা শুধু আধুনিকতাবাদী চিন্তা নয়, ভাষা-বিনির্মাণের প্রয়োজনবিষয়ক প্রশ্নও তুলেছেন। *নিসর্গ* পত্রিকায় প্রকাশিত এজাজ ইউসুফীর একটি লেখা থেকে আংশিক পড়া যাক :

> ভাষা আজ আধুনিকতার শ্রেষ্ঠতার ঘেরাটোপ এবং ঔপনিবেশিক নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে প্রকৃত বাঙালির ভাষা হওয়ার জন্য উদগ্রীব। উপনিবেশ সশরীরে প্রস্থান করলেও তার ঔপনিবেশিক কালখণ্ড এবং সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক বর্গ ও চিহ্নগুলো রেখে গেছে। সুতরাং বিনির্মাণ প্রয়োজন আজ বাংলা ভাষার। (২০০০ : ৭৬)

৮.

আমার লেখা এখানেই শেষ করব। রূপরেখামূলক এই গদ্য-পরিসরে আমি বুঝতে চেয়েছি ফরাসি ভাষা, সাহিত্য, শিল্পকলা, দর্শনের সঙ্গে বাংলাদেশের কবিতার সম্পর্কের ধরণটি দেখতে আসলে কেমন। সাধারণভাবে ইঙ্গো-মার্কিন কবিতার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের কবিতার আধুনিকতা বিচার করা হলেও ফরাসি মননের ঝোঁকটি কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বা আছে তা খতিয়ে দেখা হয়নি। আমার অনুমান, ভবিষ্যতের কোনো ফরাসি ভাষা জানা গবেষক নিশ্চয়ই এই অনালোকিত খাতটির রেখা ধরে হাঁটবেন। ততোদিন পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষাপর্ব চলুক।

সহায়কপঞ্জি

আবদুল মান্নান সৈয়দ (১৯৮৯), *চেতনায় জল পড়ে শিল্পের পাতা নড়ে*, শিল্পতরু প্রকাশনী, ঢাকা

(১৯৮২), *পরাবাস্তব কবিতা*, চারিত্র, ঢাকা

আসাদ চৌধুরী (১৯৮২), *কোন অলকার ফুল*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮২
এজাজ ইউসুফী (২০০০), *নিসর্গ*, বগুড়া
বুদ্ধদেব বসু (১৯৮৮), শার্ল বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা, দে'জ পাবলিশিং , কলকাতা
মোহাম্মদ রফিক (১৯৯৭), *খোলা কবিতা*, সমষ্টি, ঢাকা, তৃতীয় বর্ধিত সংস্করণ, ১৯৮৭
(২০০১), *ত্রয়ী*, ঐতিহ্য, ঢাকা
রফিক আজাদ (২০০৯), *কোনো খেদ নেই*, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা
(২০০৭), *কবিতাসমগ্র*, অনন্যা, ঢাকা
রফিক নওশাদ (১৯৭২), *কালপুরুষ*, মার্চ
র‍্যাঁবো, *নরকে অনন্ত ঋতু*, অনুবাদ : লোকনাথ ভট্টাচার্য, এবং মুশায়েরা, কলকাতা
শহীদ কাদরী (২০০৭), *শহীদ কাদরীর কবিতা*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা
শামসুর রাহমান (২০০১), *শামসুর রাহমানের প্রবন্ধ*, শ্রাবণ প্রকাশনী, ঢাকা
(১৯৯৯), *শামসুর রাহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা
সালাহউদ্দীন আইয়ুব (১৯৯৪), *একবিংশ*, সম্পাদক : খোন্দকার আশরাফ হোসেন, আগস্ট, ঢাকা
সিকদার আমিনুল হক (১৯৯৫), *মৃত্যুচিন্তা : এবার হলো না গান*, শিল্পতরু প্রকাশনী, ঢাকা
শ্রেষ্ঠ কবিতা (২০০১, *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা
সাক্ষাৎকার (২০০৪), সালাম সালেহ উদদীন, অন্তরঙ্গ আলোকে, হাসি প্রকাশনী, ঢাকা
সুদেষ্ণা চক্রবর্তী (১৯৯৭), সলিল বিশ্বাস, *ছায়া হারলেমে*, পিপলস বুক সোসাইটি, কলকাতা।
সৈয়দ শামসুল হক (১৯৯৭), *হৃৎকলমের টানে*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা

Aime Cesaire (1969), *Return to my Native Land*, Trans. John Berger and Anna Bostock, Penguin Books, Middlesex, England